আমাদের ঘুড়ি ওড়ানো

সত্য, সুন্দর ও শিব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক বদলে গেছে। মানুষের জীবনচর্যা ও ভাবনাচিন্তায় একবিংশ শতাব্দীতে ঘটে গেছে কত না রূপান্তর। বদলে গেছে গ্রাম প্রকৃতির চেহারা মেট্রোপলিসের আগ্রাসী চেহারা। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ভোগবাদের তাৎক্ষণিক হাতছানিতে দ্রুত পরিবর্তনশীল। আর এই প্রেক্ষিতে শিল্প সাহিত্য সেই সাবেকি ঘোমটা টেনে এরিস্টোটলের সংজ্ঞায় বন্দী থাকবে, তাও কি হয়? হুইটম্যান রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডস বর্ণিত সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্যাণের, কল্যাণের সঙ্গে শাশ্বতের বিবাহ এখন ভেঙ্গে যাচ্ছে কতবার। বাসস্টপের দাঁড়িয়ে থাকা পসারিনীর চোখে সর্বনাশা ইঙ্গিতে জ্বলে উঠতে পারে কবিতা এখন যে কোন সন্ধ্যায় বিজ্ঞাপনের নিয়নের মতো। জীবনের দীর্ঘশ্বাস আর অতিজীবনের পক্ষে বিধুনন গড়ে তোলে কবিতার আত্মা। প্রাত্যহিকের ঝংকার আর অনন্তের উড়ো চিঠি, হিরোসিমার আতংক আর বেকার যুবকের দুঃসাহসী প্রেম সব কিছুই এখন নিত্য নতুন ঠিকানা গুঁজে দিচ্ছে কবিতার হাতে।

মানুষের থাকে শরীর ও আত্মা। স্থূল ও সূক্ষ্ম সত্তা। এককে বাদ নিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব থাকে না। কবি সন্ন্যাসী পরমানন্দ সরস্বতীর ভাষায় আত্মার সত্য থেকে যে সাহিত্য আবির্ভূত নয়, সে সাহিত্য মহৎ হয় না। মহৎ কাব্য মানুষকে দেয় মহৎ বাঁচার প্রেরণা। এই পৃথিবীতে শুধু জরা ব্যাধি মৃত্যুই সত্য নয়— একে ছাপিয়ে তার অসীমে ধ্বনিত হচ্ছে এক অবিনাশী প্রাণের, গানের, জীবনের জয়ধ্বনি। আনন্দই কবিতার আত্মা।

যিনি ঈশ্বর ও কবিতা নিয়ে ভাবতেন গভীর ভাবে, তাঁর কাছে কবিতার মধ্যে নিহিত থাকে এক অন্যতর, মহত্তর জীবনের চাবিকাঠি। কিন্তু এ ধারণাও একপেশে বলে মনে হতে পারে, এডগার এলেন পো বা বঁদেলেয়রের কবিতায় মুগ্ধ যারা, আধুনিকতার মধ্যে খুঁজে পান চরিত্রহীন শিকড়হীন ফলাফলহীন এক উত্থান বা পাতালদর্শন। ভালোমন্দ, পাপপুণ্য, সত্যমিথ্যে, শাশ্বত ও তাৎক্ষণিক সেখানে একাকার। কবিতার এই সর্বগ্রাসী গেরুয়া বেনোজল এখন আমাদের কোমর ধরে নাচছে। কবিতা এখন সংস্কারমুক্ত ছক ভাঙা এক বেপরোয়া দাপট। আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে।

।। দুই।।

মানব চৈতন্যের জটিলতা নিরন্তর বাড়ছে। তথ্য প্রযুক্তির বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের ও বিশ্বায়নের ফলে চেনা জগতের ছবি পালটে যাচ্ছে দ্রুত, মুহুর্মুহু। কবিতার কাছে চাওয়া পাওয়াও পালটে যাচ্ছে ক্রমাগত।

কবিতার রূপ-শরীরও আত্মাও বদলে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কারণে। তবু কিছু কিছু যেন বদলায় না। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, "মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।" এই চিরপদার্থ অর্থাৎ মানব চিন্তার ও অস্তিত্বের সারাৎসারই কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখে। জোনাকিদের নশ্বরতা দূর নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চায় এই চিরপদার্থের উদ্‌গত ডানায় ভর করে। একই ভাবনা কিন্তু উত্তর আধুনিকদেরও। আবহমান জীবনের লৌকিক উপাদানের ওপর ভর করে অলৌকিক উড়ালের কথা তাঁরা ভাবেন। কেবল প্রকরণে ও গঠনে তাঁরা বিনির্মাণবাদীদের ঘরানার আত্মীয়।

একটু নিবিড় পাঠের ও মননের ফসল হিসেবে, অবশেষে এবং প্রধানত, আমরা দেখতে পাবো কবিতা হচ্ছে মানব জীবনের বিমূর্ত বাণী। সেই বাণী অবশ্যই অবলম্বন করে মানব জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ও অনুভব, সূক্ষ্ম জীবন যেমন স্থূল শরীরকে আশ্রয় করেই দীপিত হয়ে ওঠে।

কবিতার আশ্রয়ী এই অনুষঙ্গমালা এরকম :

।। প্রকৃতি → জীবন → রহস্য → মৃত্যু → বিস্ময় → হতাশা → বিষাদ → আনন্দ → জন্ম বিবাহ → প্রকৃতি → ইতিহাস → পরিবেশ → সমাজ → সংগ্রাম → কল্পনা → প্রেম ভালোবাসা → সুখদুঃখ → নশ্বরতা → অনন্ত তৃষ্ণা।। প্রত্যক্ষ → পরোক্ষ → শব্দ ধ্বনি ব্যঞ্জনা রূপক প্রতীক চিত্রকল্প → ছন্দ → নির্মাণ / বিন্যাস।। প্রকরণ / পরিবেশন।।

।। কবি → পাঠক → প্রচারমাধ্যম → তৎকালিক → চিরায়ত।। ব্যক্তিজীবন → আন্তর জীবন → বহিরঙ্গ → যৌথজীবন → সমাজচেতনা → কালচেতনা → অধ্যাত্মচেতনা → বাস্তববাদী বস্তুবাদী → ভাববাদী → সামাজিক / অর্থনীতি / সাংস্কৃতিক → গূঢ় চৈতন্যজাত → প্রাতিস্বিক → বিমূর্ত।।

এই সব অনুষঙ্গ, চারিত্র্য, মাত্রা ও রূপাভাসকে ছুঁয়ে কবিতার পথ চলেছে, নানা ভাবধারার নানা ভাবনার পথিকদের নিয়ে নানা গন্তব্যে। ফেরিওলা থেকে বাউল স্বপ্নের সওদাগর থেকে বিপ্লবী সবাই সামিল সে মিছিলে।

রস কেবলই আস্বাদনের। রসায়ন বিশ্লেষণ সেখানে আমার অভিপ্রেত নয়, সে কাজও কদাপি আমার নয়। আসুন পাঠক, এত সব ভণিতার পরে মানচিত্র ছেড়ে পা রাখি আমরা মাটিতে। যে মাটি ধারণ করে আকাশের বৃষ্টিধারা, বহন করে বীজ, সৃষ্টির।

।। তিন।।

ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আমাদের জীবনের এক নেপথ্য অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে থাকে। কবিতার ক্ষেত্রেও। পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির মধ্য থেকে উৎসারিত এক চিরকালীন মূল্যবোধ হস্তান্তরিত হতে থাকে নানা পর্যায়ে। দৈব মহিমার মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হয় অপরাজেয় মানুষের মূর্তি। তার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ক্রমশ বিস্তারিত জীবন ও সমাজের সঙ্গে জড়িত হয় এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে। গীতিকবিতার সচলতা চেহারা ও জামা বদলে আত্মজৈবনিক উচ্চারণে রূপান্তরিত হয়।

শেকসপিয়রের নাটকে ছড়িয়ে আছে কবিতার দানছত্র। এবং তা এতকাল পরেও সমান জনপ্রিয়, কারণ তার মধ্যে নিহিত আছে মানব জীবনের নানা আবেগ, সংকট ও জটিলতাময় অধ্যায়— আমাদের চেতন ও অবচেতনের রহস্যময় উদ্ভাস, কখনো আনন্দের কখনো তীব্র যন্ত্রণার— যা এখনো সমান প্রাসঙ্গিক।

মৃত্যুর গোধূলি ছায়ায় বোনা হয়েছে এমিলি ডিকিনসনের কত না কবিতা, যা এখনো সমান স্মরণীয়। কেননা মৃত্যুচেতনা মানুষকে কখনো ছেড়ে যায় না। আর মৃত্যুচেতনা জীবনচেতনারই নামান্তর। যে রুশ কবি মায়কভসির প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল সমাজ সচেতনতা ও বিপ্লব, তাঁর আত্মহননের উপলক্ষিত কবিতাটি এখনও হৃদয় স্পর্শ করে আমাদের। লেনিন পছন্দ করতেন পুসকিনের কবিতা। ডিকিনসনের সমকালীন ফরাসি কবি র‍্যাঁবোর শিকড়হীন অবাস্তব কল্পনার উদ্ভ্রান্ত খেলা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। মাতাল তরণীর পাঠক সংখ্যা দেশে দেশে নানা সময়ে অগণন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব কালজয়ী কবিতার আঁচলের নিয়ে ঢাকা আছে বিদেহ ভালোবাসার রত্নদীপ। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'শেষ বসন্ত' তারই একটি উদাহরণ মাত্র। জার্মান

কবি রিলকের কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে প্রকৃতি, মৃত্যু ও যন্ত্রণার অনুষঙ্গ— ব্যঞ্জনাকে ছাড়িয়ে নতুনতর মাত্রা খুঁজেছে তার ব্যবহৃত শব্দমালা। লোকজীবনের স্পন্দন ও গীতিময়তা স্পেনিশ কবি লোরকার কবিতাকে করেছে কালজয়ী। বিপ্লবী চেতনার দুই কবি ব্রেশট ও নেরুদা দুরকম ভাবে মানুষের সংগ্রাম ও ভালোবাসার কথা বলেছেন। কবিতা হিসেবে মান্য না হলে কোন লোকহিতকর বাণী পেত না এতো দিনের আয়ু। কবিতা মানুষের জন্য। নৈর্ব্যক্তিক তুখোর, চমকে দেবার ক্ষমতা এবং আধুনিক চিত্রকল্পের সম্ভার নিয়ে এলিয়ট সাহেব শতাব্দীর পোড়োমাটিতে দাঁড়িয়ে যে বিপন্নতায় বিদ্ধ করেন আমাদের তা তাৎক্ষণিক। তার থেকে আরো বেশিদূর নিয়ে যান বরিশালের জীবনানন্দ দাশ।

।। চার।।

প্রত্যক্ষ কবিতার পক্ষে তবে কি সুদূরগামী হওয়া দুঃসাধ্যব্রত? বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে বাঙালি পাঠকেরা সম্ভবত ভিন্নমত পোষণ করেন। যা সত্য, যা মানবিক তার জয় অবশ্যম্ভাবী। ভড়ং বা ভান, ছদ্মবেশ বা আরোপিত মহিমা চিরস্থায়ী।

'ব্রুকলিন ব্রিজ' নিয়ে দুটি কবিতা আছে। একটি মায়কভসকির। প্রত্যক্ষ ও বাস্তব বর্ণনা। সেটি সহজেই ম্লান হয়ে যায় হার্ট ক্রেনের 'দি ব্রিজ' কবিতার পাশে। হার্ট ক্রেনের সেতু তার বাস্তব অবয়ব ভেঙে এক নিগূঢ় উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দেয় আমাদের অবলীলায়। এই জাদু মহৎ কবিতার সহজাত।

পাঠকের সঙ্গে সার্থক সেতু তৈরির রহস্য কবির করায়ত্ত। সেখানে উন্মুক্ত ভাবনা ও কল্পনাকে পাঠকদের হৃদয়ে ও মগজে চালান করে দেবার জন্য কবিকে হতে হয় এক কুশলী স্থপতি। তাঁর শব্দ নির্বাচন, ছন্দোনৈপুণ্য, প্রকরণগত সিদ্ধি ও বৈচিত্র্য পাঠককে আকর্ষণ করে, সহপথিক করে তোলে। কবিতা এক দ্বৈত অভিসার। তাই যতোই বাহানা বা যুক্তির জাল তৈরি করা যাক না কেন, দুর্বোধ্য কবিতা পাঠক ও কবির মধ্যে বিরহকে বাড়ায়। যেমনটি করে স্থূলতাও। তবু এক চেতন প্রবাহের অন্তর্গত শৃঙ্খলছুট উদ্বায়িতা যখন ঘনিয়ে আনে জটিলতার প্রদোষাচ্ছন্ন বোধ, তার প্রকাশ প্রক্রিয়াও হয়ে ওঠে অসরল ও গোপন সোপানচারী। সে ই মনন প্রধান জটিলতা পেয়ে যায় সীমিত ছাড়পত্র। সহসা স্মৃতিধার্য উদাহরণ প্রুস্ত বা জেমস জয়েস, আংশিকভাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা রমেন্দ্র আচার্যচৌধুরী। লক্ষ করার মতো বিষয়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির সহজ সরল ইন্দ্রজালে এমনই মগ্ন ছিলেন যে স্বভাবগত স্বচ্ছতায় তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছিল নিরলঙ্কার, বাহুল্যবর্জিত এবং গভীর। বাইরের প্রকৃতি ও অভিঘাত কবির ভিতরে যখন নতুনতর বোধের জন্ম দেয়, তখনই ঘটে এক জাগরণ, যাকে উত্তরণও বলা যায়। চেনা বস্তুপুঞ্জকে উত্তীর্ণ হয়ে তখন এক অচেনা বস্তু নিরপেক্ষ উপলব্ধির দিকে আমাদের নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কম বয়সে লেখা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হৃদয়ে উৎসারিত এক ঝর্ণাকে চিনিয়ে দেয়। ব্লেকের অনেক কবিতায় এই ধর্মচিহ্ন দেখা যাবে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা বিহারীলালের প্রকৃতি এখন আনুষ্ঠানিক স্মৃতিচারণা। শেলির পশ্চিমা ঝড়ো হাওয়ায় বিপ্লবের স্বাগত ধ্বনি থাকলেও এক বলীয়ান জাগরণের গান শোনায় আমাদের। পুরোনো হয় না সমাজ বদলের ডাক, পুরোনো হয় না যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নতুন জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন। কেবল স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দায়বদ্ধতার ঘোষণা শ্লোগান হয়ে উঠলে কবিতা নিঃশব্দে বিদায় নেয়। তার দৃষ্টান্তও অনেক। উল্লেখে বিরত থাকাই সঙ্গত।

সময় এক উদ্দাম ঘোড়া। সে চায় যোগ্য সওয়ার। অশ্বমেধের

ঘোড়া তুলে নেয় তার সময়ের কবিকে সেই কালজয়ী অভিযাত্রায়। তার খুরের তলায় পিষ্ট ধূলিধূসর হওয়ার নিয়তি এড়াতে পারেন না অনেকেই।

অনেক মিথ, পুরাণ, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দে জীবনের সংগ্রামকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন, কবিতাকে এক যুগদর্পণ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এই মর্ত্যলোকই তাঁর অমরাবতী। মননের বেড়াজালে ঢাকা সেই অভয়ারণ্যের সৌন্দর্যও তবু অবারিত রইলো না আমপাঠকের কাছে। সেই সিদ্ধি করায়ত্ত ছিল সদ্যোপ্রয়াত চল্লিশের অগ্রণী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। সে শুধু পাঠককে জয় করে নেবার মতো চলতি পায়ে চলার পথের ছন্দ আর মানুষের মুখের কথার অবাক হয়ে যাবার মতো ব্যবহার। প্রত্যক্ষ বিষয়ই যার বিষয় তাঁকেও দেখি এক বহমান নদীর প্রতীককে কি আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি নিয়ে আসেনি কবিতায়। ঋজু, গদ্য, নাটক ও গল্প সব মিলে মিশে হয়ে ওঠে স্মরণীয় একটি কবিতা। 'তারপর যেতে যেতে যেতে / এক নদীর সঙ্গে দেখা / পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা / পরনে / উড়ু উড়ু ঢেউয়ের / নীল ঘাগরা'...সেই নদী শেষ পর্যন্ত আমাদের আশা, আমাদের জীবন হয়ে ওঠে।

।।পাঁচ।।

তাহলে দেখা যাচ্ছে জীবনানন্দ বর্ণিত সেই 'মানুষের মনের চিরপদার্থ' নানা প্রক্রিয়ায় মূর্ত, বিমূর্ত হয়ে ওঠে মানুষকে কেন্দ্র করেই। প্রতিটি মুহূর্ত অতীত হবার জন্যই তৈরি। মানুষের শ্রেষ্ঠ সময় বর্তমান। প্রতি মুহূর্তে সে বদলাচ্ছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে নতুন। সে আধুনিক। তাই প্রত্ন কবিতা বা উত্তরাধুনিক কবিতার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন নই। আমরা কেবল আধুনিক কবিতার জন্যই সর্বদা সাগ্রহ। নশ্বরতার মধ্যে এই ভাবে বেঁচে থাকে অবিনশ্বরতা— শিল্পের ঈশ্বর। সে কখনো ভোগবাদের পণ্য নয়, নয় বিজ্ঞাপন নির্ভর। কিন্তু কোথায় সে ঈশ্বর! সৌরলোকের এক লক্ষ বামন গোল হয়ে যখন নাচ শুরু করে রক্তমাংসের আগুন ঘিরে, যখন কবিতা হয়ে ওঠে প্রচার মাধ্যমের ক্রীতদাসী, কবির থকে বড় হয়ে ওঠেন সংগঠক, আবৃত্তিকার ও বাচাল সঞ্চালক, তখন আমরা বড় হতমান ও প্রবঞ্চিত। খুঁজে বেড়াই তাকে বইমেলার ধুলোর ঝড়ে, আত্মগোপন ক্লাসিক লাইব্রেরিতে, বৃষ্টিভেজা ঘাসের শিকড়ে বা আকাশের দিকে ভেসে যাওয়া কোন ছিন্ন ঘুড়ির দুঃখী সুতোয়— ঈশ্বর নয়, সাময়িকের ভাঙা আয়নায় দেখি আমাদের বিপর্যয়ের চেহারা। পরাজয় ও অসম্মান যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে যন্ত্রের সেবাদাসত্বে, আত্মপ্রচার ও বিনোদনের প্রলোভনে তখন সেই আত্মিক দুর্ভিক্ষ থেকে কবিতাই পারে আমাদের উদ্ধার করতে। আমাদের আশা তবু অফুরান। নানা রঙের অজস্র ঘুড়িতে ছেয়ে গেছে আমাদের আকাশ। কোনটি বা পাড়ার ল্যাম্পপোস্টে আটকে গেছে, কোনটি বা জড়িয়ে গেছে দশতলা বাড়ির এন্টেনায়। দেয়ালির রাতে অজস্র পতঙ্গ। তারই মধ্যে কেউ কেউ কি ছুঁয়ে দেবে না মেঘের বিদ্যুৎ কিংবা মেঘ পেরিয়ে নিজেই হয়ে যাবে আকাশ! আশা-ই আমাদের জীবন, আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।